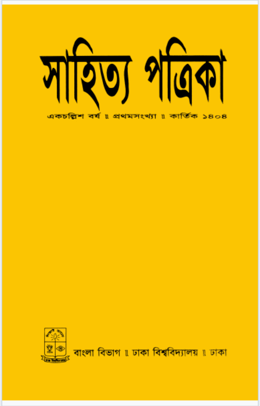

Vol. 41 | No. 1 | 1997

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

ময়মনসিংহ গীতিকায় নারী চরিত্র

Volume	41
Issue	1
Year	1997
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মোঃ শহীদুর রহমান
Published online	October 1, 1997
DOI	10.62328/sp.v41i1.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v41i1.5
Pages	90-107
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

ময়মনসিংহ গীতিকায় নারী চরিত্র

মোঃ শহীদুর রহমান*

ময়মনসিংহ গীতিকায় প্রস্ফুটিত বিভিন্ন নারীর বিচিত্র চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাক্ষাৎ লাভ করা যায়। এসব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্রেম-নিষ্ঠা, সংযম-সহিষ্ণুতা, উদ্ভাবনী শক্তি, তেজস্বিতা, সতীত্ব, পাতিব্রত্য, আত্মত্যাগ, আত্মসচেনতা, ব্যক্তিত্ব ও সরলতাই প্রধান। এগুলোর স্পর্শে প্রতিটি পালায় নারী চরিত্রসমূহ বিশেষ করে নায়িকা চরিত্রগুলো অন্যান্য চরিত্রের তুলনায় অধিকতর উজ্জ্বল হয়েছে। এতে একদিকে যেমন নারীর অকৃত্রিম রূপটি অনাবৃত হয়েছে—অন্যদিকে ময়মনসিংহ অঞ্চলের পল্লীবালাদের আবহমান কালের প্রকৃত স্বরূপও প্রকাশিত হয়েছে। এসব পালা বা গীতিকায় নারী চরিত্রের অন্ধকার দিকগুলোর প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে যা সমকালীন সামাজিক মূল্যবোধের পরিচায়ক। উপরন্তু, মঙ্গলকাব্যের পরবর্তীকালে, বিশেষ করে গীতিকার অনুবর্তী বাংলা সাহিত্যে নারী প্রাধান্য একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য বলে বিবেচিত হয়। এসব দিক লক্ষ্য করে বাংলা গীতিকা সমুদয়ের নারী চরিত্রের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন আবশ্যক বলে আমরা মনে করেছি।

ময়মনসিংহ গীতিকায় বিকশিত নায়িকা চরিত্রসমূহ সবাই সহজাত হৃদয়বৃত্তির দিক থেকে অনন্য স্বাধীন প্রেমিকা। অনুত্তরণীয় শত প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও তারা প্রেমের মহিমায় প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে। একথা সমালোচক, গবেষক ও পণ্ডিত ব্যক্তি[১] স্বীকার করেন এবং আমরা গাথাগুলো থেকেও তার প্রত্যক্ষ প্রতিধ্বনি শুনতে পাই ঃ

মুখের বাঁশী বুকে তোমার চিকন দাগ কাটে।
সে বাঁশী ভুলিতে বন্ধু হিয়াখানি ফাটে।।[২] –আন্ধাবন্ধু

---

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

১. ড. দীনেশচন্দ্র সেন, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, সুখময় মুখোপাধ্যায়, ডঃ আহমদ শরীফ, ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত প্রমুখ সমালোচক, গবেষক ও পণ্ডিত ব্যক্তিসহ সবাই গীতিকায় বিকশিত নারী চরিত্রের উদার হৃদয়বৃত্তির কথা তুলে ধরেছেন।

২ দীনেশচন্দ্র সেন, *পূর্ববঙ্গ-গীতিকা* (৪র্থ খণ্ড), পৃ. ১৯৩

এই বাঁশীর সম্মোহনে রানী রাজাকে পরিত্যাগ পূর্বক অন্ধ বংশীবাদকের সঙ্গে রাজপ্রাসাদ থেকে বহির্গত হয়ে মুক্ত স্বাধীন প্রেমের জন্য অনিশ্চিতের পথে পা বাড়িয়েছে। এই যে মুক্ত প্রেমের আকুল আবেদন, যে আবেদনে সকল মানুষের হৃদয় সম্মোহিত হয়—তার উৎপত্তিগত কার্যকারণ হলো বাংলার প্রতিবেশ, বিশেষত ঐ যুগের পূর্ব ময়মনসিংহ অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি-নিসর্গ-জনজীবন ও সমাজমানস। কিন্তু এই অবাধ মুক্ত-স্বাধীন প্রেমের প্রস্রবণে যখনই 'আর্য-ব্রাহ্মণ্য সমাজ-সংস্কার-সংস্কৃতি প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে'[৩] তখনই গীতিকার নায়িকাবৃন্দের অধিকাংশই তেজস্বিতা, সংযম-সহিষ্ণুতা, পাতিব্রত্য ও আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে পিছুপা হয়নি ঃ

কেমনে মারিব আমি পতির গলায় ছুরি।
খারা থাক বাপ তুমি আমি আগে মরি।।[৪] - মহুয়া

এ কথা বলেই মহুয়া হোমরা বেদের আদেশ অগ্রাহ্য করে ও তদ্‌প্রদত্ত বিষলক্ষের ছুরি নদের চাঁদের বুকে বিদ্ধ না করে বরং নিজের বুকে বিঁধিয়ে তার অমর প্রেমের শক্তি ও ত্যাগের মহিমা সমুজ্জ্বল করে তুলেছে। দেবেন্দ্রে কুমার ঘোষ বলেন, "ময়মনসিংহ গীতিকার নারী চরিত্রগুলি একনিষ্ঠ প্রেম ও ত্যাগের মহিমায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। সরলা পল্লী বালার স্বাভাবিক প্রণয় শুধুমাত্র ইন্দ্রিয় বিলাসের মোহ নয়, ইহা প্রিয়তমের প্রেম-পূজায় আত্মবিসর্জন।"[৫] এ ধরণের বলিষ্ঠ প্রেমের কারণে আত্মবিসর্জিত হৃদয়-গ্রাহী বিষাদাত্মক চরিত্রের প্রতিবিম্বগুলো হলো ঃ 'মুলয়া', 'চন্দ্রাবতী', 'কমলা', 'লীলা', 'সোনাই', 'রূপবতী', 'সখিনা', 'দেওয়ানা মদিনা' প্রভৃতি।

এসব নায়িকার অনেকেই আত্মবিসর্জনের পূর্বে সহজাত বৃত্তি-প্রবৃত্তির কারণে সার্থক উদ্ভাবনী শক্তিবলে বিপদ-মুক্তির মানসে দুঃসাহসী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং শত্রুকে পরাজিত করে আপন প্রতিভায় দীপ্তিময় হয়ে উঠেছে ঃ

---

৩. নীহার রঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস* (আদিপর্ব) পৃ. ২৬৭, "ব্রাহ্মণেরা এই অবিবাহিত নর-নারীর প্রেম কাহিনী সমর্থন করিলেন না।"
দীনেশ চন্দ্র সেন, *বৃহৎবঙ্গ*, কলিকাতা, ১৩৪১, পৃ. ৩৮৫-২৮৬

৪. দীনেশ চন্দ্র সেন, *মৈমনসিংহ-গীতিকা* (১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা), কলিকাতা, ১৯৫৮ পৃ. ৩৯-৪০

৫. শ্রীদেবেন্দ্রে কুমার ঘোষ, *প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস*, কলিকাতা, ১৯৫৯, পৃ. ৩১৪

বার মাসের বর্ত্ত মোর নয় মাস গেছে।
পরতিষ্টা করিতে আর তিনমাস আছে।। ....
এই তিনমাস মোর না আইস অন্দরে।
সময় হইলে গত বলিবাম তোমারে।।[৬] – মলুয়া

এখানে মলুয়া তার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে কূটকৌশলে ব্রতানুষ্ঠানের[৭] ছলাকলায় দেওয়ানকে ভুলিয়ে শত্রু কাজিকে নিহত করেছে ও পরিশেষে সতীত্ব রক্ষাপূর্বক দেওয়ানকে পরাভূত করে তার হাবলি থেকে মুক্তি পেয়েছে। এ ধরণের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে 'মহুয়া' 'ভেলুয়া', 'কমলা' প্রভৃতি নায়িকা। এরা এদের উদ্ভাবনী শক্তিতে কখনো কূটকৌশলের পরিচয় দিয়েছে, আবার 'পোর্শিয়ার' মতো[৯] অকাট্য যুক্তির ওকালতিতে স্বামীকে উদ্ধার করে ঘরে ফিরেছে। কিন্তু মনে হয় এই যুক্তি-বুদ্ধিদীপ্তির পিছনে বংশানুক্রমে চলে আসা মেয়েদের ব্রতগুলোও কম কাজ করেনি। কারণ, বিপদকালে কিংবা স্বাভাবিক সময়ে এগুলোতে নারী হৃদয়ের কামনা-বাসনার গতিপথ ধরে পাতিব্রত্যের পরাকাষ্ঠা প্রকাশিত হয়েছে। এ যেন শাশ্বত বাঙালি নারীর এক ধরণের প্রেমধর্ম যা গীতিকাগুলোকে আশ্রয় করে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। এর গভীরতা সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, "কেবল এই মেয়েলি ব্রতগুলির মধ্য দিয়ে আমরা সেই সব দিনের মধ্যে গিয়ে পড়ি যেখানে আমাদের পূর্বতন পুরুষ অন্যব্রতরা তাদের ঘরের মধ্যে রয়েছেন দেখি। সব উপরে হিন্দু অনুষ্ঠানের অনেকটা গঙ্গা মৃত্তিকা, গৈরিক এমনি সব নানা মাটির একটা খুব মোটা রকমের স্তর ; তারপর বৈদিক আমলের মূল্যবান ধাতু স্তর, তারো তলায় অন্যব্রতদের এইসব ব্রত একেবারে মাটির বুকের মধ্যেকার গোপন ভাণ্ডারে।.... কাজেই এই ব্রতগুলি মেয়েদের পক্ষে পুরুষানুক্রমে এতকাল চলে আসা আশ্চর্য নয়।"[১০] গীতিকারগণ নারী

---

৬. *মৈমনসিংহ-গীতিকা* (১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা), পৃ. ৮৮-৮৯

৭. জ্ঞানত বা অজ্ঞানত বিশেষ তিথিতে যদি কোন পুণ্যকার্য করা যায় তবে তার দ্বারা মানুষের পুণ্য অর্জন এবং সৌভাগ্য ঘটে – এই হলো ব্রতগুলির মোট কথা। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *বাংলার ব্রত*, পৃ. ১২ ; "ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের যে দশা বিপর্যয় ঘটতে দেখা যায় সেইগুলোকে ঠেকাবার ইচ্ছা এবং চেষ্টা থেকেই ব্রত ক্রিয়ার উৎপত্তি।" ঐ, পৃ. ৬

৯. দীনেশচন্দ্র সেন, পুরনারী, কলিকাতা, ১৯৩৯, পৃ. ১৫

১০. *বাংলার ব্রত*, কলিকাতা, ১৩৫০, পৃ.৪

আমাদের গ্রাম্য সমাজে, বিশেষভাবে নারীদের ভিতর যেসব ব্রত আজও প্রচলিত তাহার অধিকাংশই অবৈদিক, অস্মার্ত, অপৌরাণিক ও অব্রাহ্মণ্য এবং মূলত গুহ্য যাদু ও প্রজনন

চরিত্রগুলোকে অনেকখানি পরিমাণ মানবিক ও স্বাপ্নিক প্রেমিকারূপে গড়ে তুলেছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু এ প্রেমের ধারা মধ্যযুগের অন্যান্য শাখার সাহিত্যে প্রবাহিত হলেও গীতিকাগুলোর সঙ্গে তার মূলগত পার্থক্য বিদ্যমান। একথা মঙ্গলকাব্য, পদাবলি, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও পুথিসাহিত্যে বিকশিত প্রেমের সঙ্গে গীতিকায় প্রস্ফুটিত প্রেমের তুলনামূলক আলোচনা করলেই অনুভব করা যায়।

মঙ্গলকাব্যগুলো পর্যালোচনা করলেই উপলব্ধি করা যায় যে, এ কাব্যগুলোতে প্রেম যেন এক সম্ভোগজনিত আকর্ষণ ছাড়া আর কিছুই নয়। সেখানে হৃদয়বৃত্তির প্রাণচাঞ্চল্য মনে হয় নানাবিধ বিধিনিষেধের অভিঘাতে রুদ্ধ হয়ে গেছে। সংসারের যাতাকলে, পরিবার ধর্মের বেড়াজালে, সতীন-বিমাতার কোন্দলে, সামাজিক দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের কবলে, ধর্মীয় কুসংস্কারের অন্ধগলিতে নরনারীর পূর্বরাগজনিত রোমান্টিক প্রেম যেন নির্মমভাবে আহত হয়েছে। তাই সেখানে বিদুষী নারী কালো স্বামী সম্পর্কে বলছে ঃ

সাধ করে শিখিলাম কাব্য রস যত।
কালার কপালে পড়ে সব হৈল হত।।[১১]

— অন্নদামঙ্গল (নারীগণের পতিনিন্দা)

আবার হতাশায় পত্নী অন্ধপতি সম্পর্কে বলছে ঃ

মন্দভাগা অন্ধপতি দ্বন্দ্বে মাত্র ভাল।
গোরা ছিনু ভাবিতে ভাবিতে হৈনু কাল।।[১২] - (ঐ)

এমনিভাবে স্ব-পত্নীর দ্বন্দ্বে কিংবা বৃদ্ধ পতির সঙ্গে যুবতী বধূর সামঞ্জস্যহীন সম্পর্কের কারণে স্বাধীন প্রেমের গতি যেন থেমে গেছে। তাই বোধ করি ক্ষেত্রগুপ্ত বলেন, "মঙ্গলকাব্যে নর-নারীর সম্বন্ধ অতি সাধারণ ও মামুলী দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যেই সীমিত। সৌন্দর্য ও কল্পনার কোন উচ্চ ভাবরাজ্যে তার অভিযান নয়।

শক্তির পূজা, যে পূজা গ্রাম্য কৃষিসমাজের সঙ্গে একান্ত সংপৃক্ত।" *বাঙ্গালীর ইতিহাস*, পৃ. ৫৮২

১১. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পাদিত), *ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী*, কলিকাতা, ১৩৬৯, পৃ. ২৫৯ (৩য় সংস্করণ)।

১২ ঐ, পৃ. ২৫৯

স্বভাবতই দাম্পত্য সম্বন্ধের দৈনন্দিনের এ পরিচয় প্রেমচিত্র হিসেবে গ্রাহ্য নয়।"[১৩] শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও প্রেমের সে উদ্দীপনা প্রথমে বলপ্রয়োগজনিত সম্ভোগ ও পরবর্তীকালে আধ্যাত্মিকতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। সেখানে কৃষ্ণ প্রথম যৌবনের চেতনাহীন রাধার দেহ-কামনায় কখনো 'মজুর হয়ে ভার বয়েছে', কখনো 'নৌকা বানিয়ে মাঝি সেজেছে'।[১৪] আবার রাধা যখন প্রেম-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এগিয়ে এসেছে, তখন কৃষ্ণের নিরুৎসাহে রাধার প্রেমের পূর্বরাগ থিতিয়ে পড়েছে ঃ

যে কাহ্ন লাগিয়া মো আন না চাহিলোঁ
বড়ায়ি না মানিলোঁা লঘু গুরুজনে।
হেন মনে পরিহাসে আম্মা উপেখিআঁ রোষে
আন লআঁ বঞ্চে বৃন্দাবনে।[১৫]

কাজেই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও আমরা মুক্ত প্রেমের প্রস্রবণ অবরুদ্ধ হতে দেখি। তাই 'মধ্য যুগের পদাবলী সাহিত্যেই সত্যকার প্রেম-গাথার পরিচয়' পাওয়া যায় বলে অনেকে মন্তব্য করেন।[১৬] কিন্তু সেখানেও "ধর্মতত্ত্ব ও দার্শনিক প্রত্যয়ের পাশাপাশি মানবীয় প্রণয়ের সুগভীর অনুভূতির প্রবাহে এ-প্রেম দ্বিধাদীর্ণ।"[১৭]

না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে।।[১৮] – দ্বিজ চণ্ডীদাস

---

১৩. ক্ষেত্রগুপ্ত, প্রাচীন কাব্য : সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নবমূল্যায়ন, কলিকাতা, ১৩৬৬, পৃ. ১৫২

১৪. ক্ষেত্রগুপ্ত, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', মাহবুবুল আলম (সম্পাদিত), *সমালোচনা সংগ্রহ*, ঢাকা, ১৩৭৭, পৃ. ৫৯

১৫. মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা (সম্পাদিত), *বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্য*, ঢাকা, ১৩৭৪, পৃ. ১৫৭

১৬. *প্রাচীন কাব্য : সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নবমূল্যায়ন*, ১৫২

১৭. ঐ, পৃ. ১৫২

১৮. মুহম্মদ আবদুল হাই ও আহমদ শরীফ (সম্পাদিত), *মধ্যযুগের বাঙলা গীতিকবিতা*, ১৩৭৫, পৃ. ৪০ (পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ)।

এখানে যেন বৈষ্ণবদর্শন ভিত্তিক পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার মিলনাকাঙ্ক্ষা প্রকট হওয়ার কারণে তত্ত্বভারে জীবন-নির্ভর প্রেমানুরাগ চাপা পড়ে গেছে। এক· রোমান্টিক সাহিত্যের বেলায়ও প্রযোজ্য। কারণ সেখানেও আলাওল প্রভৃতির কবিতায় মানবীয় ভাবাকাশের অন্তরালে সুফীবাদী ধর্ম-সাধনার প্রভাব সম্ভবত দুনিরীক্ষ্য নয়।[১৯] তাই এতক্ষণের আলোচনায় মধ্যযুগের সমগ্র কাব্যধারার তুলনায় ময়মনসিংহ্ গীতিকায় বিকশিত প্রেমের ধারাটি স্বাধীন, মুক্ত ও স্বতন্ত্র বলে উপলব্ধি করা যায়। সেখানে সমাজ, বিধিনিষেধ উপেক্ষা করে প্রেম তার নিজস্ব গতিতে অগ্রসর হয়েছে।

ফুল হইয়া ফুটিতাম বন্ধুরে যদি কেওয়া বনে।
নিতি নিতি হইত বন্ধু দেখা তোমার সনে।।
তুমি যদি হইতে রে বন্ধু আসমানের চান।
রাত্র নিশা চাইয়া থাকতাম খুলিয়া নয়ান।[২০] – দেওয়ান ভাবনা

এই অপ্রতিরোধ্য মানবিক মুক্ত প্রেমের কারণেই গাথা-গীতিকায় নারী চরিত্রের অপরিসীম প্রাধান্য লক্ষণীয়। সে কথাই ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত বলেন, "হৃদয়ের অপ্রতিরোধ্য গতিতে কিংবা সচেতন ক্রিয়ায় অনুভূতির সুগভীর তীব্রতায় নারীরাই 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র নিয়ন্ত্রণ শক্তি। আর এর চরম গৌরব আত্মত্যাগে।"[২১] আর এই স্বাধীন মানবিক প্রেম ও আত্মত্যাগের কারণে নারী প্রাধান্যই সর্বকালের বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে দৃষ্টিগোচর হয়।

সতীত্ব[২২] রক্ষা ও পরীক্ষার সংস্কারও গীতিকাগুলোর উপজীব্য বিষয় হিসেবে নারী চরিত্রের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে। এ যেন যুগ যুগ ধরে চলে আসা বাঙালি হিন্দু নারীর আজন্ম সংস্কার। এ সংস্কারের বশবর্তী হয়েও গীতিকার নারী

১৯. *প্রাচীনকাব্য : সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নবমূল্যায়ন*, পৃ. ১৫২

২০. *মৈমনসিংহ গীতিকা* (১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা), পৃ. ১৮০

২১. *প্রাচীন কাব্য : সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নবমূল্যায়ন*, পৃ. ১৫৪

২২. "সতী প্রথাকে ভারতীয় সমাজ যে সম্ভ্রমের চোখে দেখত তা নিয়ে বিশেষ মতভেদ নেই। সতীর আশীর্বাদের জন্য মানুষ থাকত উদগ্রীব, তার নিক্ষিপ্ত কড়িকে মনে করত পরম পবিত্র।" স্বপন বসু, *সতী*, পৃ. ২১। মনে হয় 'চন্দ্রাবতী গীতিকায় তার বাস্তব প্রতিফলন লক্ষণীয়। সেখানে সতী যেন এক অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারিণী।

চরিত্রগুলো তেজস্বী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে ঃ

রোষিয়া কহিল মলুয়া শুনলো কুটুনী।
স্বামী মোর ঘরে নাই কি বলিবাম তরে।
থাকিলে মারিতাম ঝাটা তর পাকনা শিরে।।[২৩] — মলুয়া

এর সঙ্গে রামায়ণের সীতার বলিষ্ঠতা তুলনা করা যায় ঃ

দূর হরে দুরাচার পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন।
আমা লাগি হবে তোর সবংশে মরণ।।[২৪]

সতীত্বের সংস্কারবশত এ বলিষ্ঠতা ও দৃঢ়তা আরো অনেক গীতিকায় দৃষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও মধ্যযুগের প্রায় সব শাখার কাব্যে লক্ষণীয়।[২৫] তাই কেউ কেউ বলেন, প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যে 'রামায়ণে', 'মহাভারতে', 'কুমারসম্ভবে', 'মৃচ্ছকটিকে', বেণীসংহারে', 'কথাসরিৎসাগরে', 'গাথা সপ্তশতীতে', 'ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে' ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের পাতায় পাতায় সতী প্রথার উল্লেখ মেলে।[২৬] কিন্তু গীতিকার নারী চরিত্রসমূহের সতীত্বের সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় ও মধ্যযুগীয় অন্যান্য সাহিত্য শাখার নারী চরিত্রের সতীত্বের মূলগত পার্থক্য বিদ্যমান। কারণ, তুলনামূলক আলোচনায় মনে হয় গীতিকার সতীত্ব হৃদয়বৃত্তির স্বতঃস্ফূর্ত সঞ্চালন, আর মধ্যযুগীয় অন্যান্য সাহিত্য শাখায় তা সমাজ-ধর্ম আরোপিত সংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়।[২৭] এজন্যই গাথা-গীতিকায় বিকশিত

---

২৩. *মৈমনসিংহ গীতিকা* (১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা), পৃ. ৭৫

২৪. শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার (সম্পাদিত), রামায়ণ (অরণ্যকাণ্ড), কলিকাতা, ১৩৭০, পৃ. ১৭৪

২৫. *সতী*, পৃ. ৫

২৬. নারায়ণ দেব ও কেতকাদাসের 'মনসামঙ্গলে', দ্বিজমাধব ও মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গলে', কৃত্তিবাসের 'রামায়ণে', 'মালাধর বসুর' 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে', 'ময়নামতির গানে', ঘনরামের 'ধর্মমঙ্গলে' ও ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে' এর উল্লেখ আছে। পৃ. ৫

২৭. সতী প্রথার জন্মের পিছনে পুরুষাধিকারের ঘোষণা 'নারী পুরুষের সম্পত্তি'- তাদের কোন স্বাতন্ত্র্য নেই, সকল বিষয়ই তারা পুরুষের অধীন, কাজেই তাকে যথেচ্ছ ভোগ দখল করার অধিকার আছে পুরুষের। চির জীবন নারী তারই থাকবে, শুধু তাই নয়, পরলোকেও তাকে তার সঙ্গী হতে হবে। জীবনে মরণে নারী শুধু দাসী। যে কোন মূল্যে তাই তাকে শারীরিক শুচিতা রক্ষা করে চলতে হবে। আর এ শুচিতা রক্ষার জন্য প্রয়োজনে নারীকে চিতায় গিয়ে উঠতে হবে। বলা যায়, "It is the consequence of an unpararelled sexual slavery imposed on women by men and society." নারী সম্পর্কে এবংবিধ মনোভাবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আদিম সমাজের পরলোক-বিষয়ক ধারণা। আদিম সামাজিক মানুষ বিশ্বাস

নায়িকা চরিত্রের স্বরূপ দর্শনে আমাদের হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে ওঠে।

তবে মনে হয় এ সতীত্বের পিছনে অপরিসীম শক্তি যুগিয়েছে আবহমানকালের বাঙালি নারী সমাজের পাতিব্রত্য। এ পাতিব্রত্যও প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য থে আরম্ভ করে মধ্যযুগের সমগ্র বাংলা কাব্যে বিস্তৃত হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও গভীর পর্যালোচনায় গীতিকাগুলোই প্রেম, সতীত্ব ও পাতিব্রত্যের দিক থেকে বস্তুনিষ্ঠ ও জীবনঘনিষ্ঠ বলে মনে হয় এবং সেজন্যই তা সমাজ-ধর্ম-কুসংস্কারজনিত সকল বিধি নিষেধের উর্ধ্বে উঠে সর্বশক্তি সঞ্চার করেছে। এমনকি একই কারণে গীতিকার নায়িকাবৃন্দ আত্মত্যাগের অপার মহিমায় উজ্জীবিত। কয়েকটি উদাহরণের মাধ্যমে তুলনামূলকভাবে বক্তব্যটি পরিচ্ছন্ন করা যেতে পারে ঃ

১. সীতার পাতিব্রত্য ঃ

ভালমতে জান প্রভু আমার প্রকৃতি।
জানিয়া শুনিয়া কেন করিছ দুর্গতি।।...
এতেক করিয়া কর আমারে বর্জ্জন।
তুমি হেন স্বামী বর্জ্জ, বৃথায় জীবন।।[২৮]

২ ফুল্লরার পাতিব্রত্য ঃ

স্বামী বনিতার পতি   স্বামী বনিতার গতি
স্বামী বনিতার সে বিধাতা।
স্বামী যে পরম ধন   স্বামী বিনে অন্যজন
কেহ নহে সুখ-মোক্ষ-দাতা"[২৯]

করত, মৃত্যুর পরও জীবনের সুখভোগ থাকে অব্যাহত, এবং সেই কারণে মানুষের স্ত্রী ও অন্যান্য বস্তুগত প্রয়োজন কোনোদিনই ফুরোয় না। তাই দেখতে পাই, যখন কোনো হিন্দু রাজা মারা যেত, তখন পরলোকে তার সুখের খোরাক জোগানোর জন্য তার সঙ্গে পুড়ে মরতে বাধ্য হত অসংখ্য স্ত্রী, রক্ষিতা, দাসদাসী, খোজা ও অন্যান্য জীবজন্তু।... অত্যাচারীর হাত থেকে নারীর মর্যাদা রক্ষার জন্য স্বীয় স্বামীর চিতায় তাদের আত্মাহুতি সমাজের সর্বস্তরে প্রচলিত হয়। সামাজিক প্রয়োজনে সমাজপতিরা একে স্বীকার করে নেয়। স্বামীর মৃত্যুর পর শোকবিহ্বল অসহায় রমণী অনেক সময়ই ভবিষ্যৎ লাঞ্ছনা ও পুরুষের লোলুপ দৃষ্টি থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যই স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যেতে লাগল। স্বপন, *সতী*, পৃ. ১৮-২১

২৮. *রামায়ণ*, পৃ. ৪৯৩

২৯. মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা (সম্পাদিত), *কালকেতু উপাখ্যান*, ঢাকা, ১৯৬৭, পৃ. ৫৫-৫৬

৩. বেহুলা ঃ

তোমা বিনে নাহি গতি, এইকাল পরকাল পতি।।[৩০]

৪. মানিকতারা ঃ

পতি যেমন আন্দাইর ঘরের প্রদীপ অইয়া জ্বলে।

সাপের মাথায় মাণিক পতি সতীর কপালে।।[৩১]

আত্মত্যাগের এমন দৃষ্টান্ত আরও অনেক গীতিকায় মেলে[৩২] এবং এরূপ আত্মদান আমাদের দেশে প্রাচীনকালে দুর্লভ ছিল না।[৩৩] কিন্তু গীতিকায় এ আত্মত্যাগের কারণ হিসেবে মুক্ত প্রেম-সতীত্ব-পাতিব্রত্য যাই বিদ্যমান থাকুক না কেন তাকে আরো দ্রুত গতিশীল, জীবন্ত ও মর্মবিদারী করে তোলার ব্যাপারে আর্য-ব্রাহ্মণ্য সমাজরোপিত ধর্ম-বর্ণবাদ কৌলিন্য প্রথা-অর্থজনিত শ্রেণী বৈষম্য, আভিজাত্য, ধনিক শ্রেণীর লাম্পট্য, রূপজমোহ ইত্যাদির ভূমিকাও কম নয়। দু' একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরে বিষয়টি পরিচ্ছন্ন করা যেতে পারে ঃ

সুখেতে থাক গো বন্ধু সুন্দর নারী লইয়া।
সুখে কর গীর বাস জনম ভরিয়া।।...
আমি যে আইছি দেশে আমার মাথা খাও।
আমার মরণ কথা বন্ধে না জানাও।।[৩৪] — ধোপার পাট

এখানে ধোপা-কন্যা রাজপুত্রের ক্ষণিক রূপজমোহে প্রতারিত হয়েছে এবং রাজকন্যা রুক্মিণী ঈর্ষায় রাজপুত্রকে আভিজাত্যের অহমিকা স্মরণ করিয়ে দিয়ে কৌশলে তাকে ধোপা-কন্যা কাঞ্চনের জীবন থেকে দূরে সরিয়ে কাঞ্চনের আত্মবিসর্জন ত্বরান্বিত করেছে। পক্ষান্তরে অন্য একটি পালায় ধনিকশ্রেণীর লাম্পট্যের আতিশয্যে গভীর ট্রাজেডি ঘনীভূত হয়েছে বলে মনে হয় ঃ

---

৩০. শ্রী যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), *মনসামঙ্গল* (কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দকৃত) কলিকাতা, ১৯৪৩, পৃ. ২৪৯

৩১. *পূর্ববঙ্গ গীতিকা* (২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা), কলিকাতা, ১৯২৬, পৃ. ২৬৮

৩২. ধোপার পাট, কাঞ্চনমালা, মহুয়া, মলুয়া, কাজলরেখা, ভারইয়া রাজার কাহিনী, দেওয়ান ঈশা খাঁ মসনদালী, রাজা তিলক বসন্ত ইত্যাদি।

৩৩. *পুরনারী*, পৃ. ১১৪

৩৪. *পূর্ববঙ্গ গীতিকা* (২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা), পৃ. ২৭-২৮

নিশি রাইতে দেওয়ান ভাবনা আইল্ বাংলা ঘরে।
আইসা দেখে পইড়া সুনাই পালঙ্ক উপরে।
বিষেতে অবশ অঙ্গ বদন হইল কালা।
অঙ্গেতে হইয়াছে কন্যার গরলের জ্বালা।।[৩৫] — দেওয়ান ভাবনা

এ যেন প্রেম সতীত্বের পরাকাষ্ঠা এবং এখানে ধনিকশ্রেণীর লাম্পট্যই যেন সোনাইয়ের জীবনে বিষাদাত্মক পরিণতি টানতে ইন্ধন জুগিয়েছে। এমনিভাবে 'চন্দ্রাবতী' ও 'কঙ্ক ও লীলা' গাথায় ধর্ম ও বর্ণ, 'শ্যামরায়ের পালা'য় কৌলিন্য প্রথা ও 'দেওয়ানা মদিনা'য় আভিজাত্যমূলক শ্রেণী বৈষম্য ট্রাজেডির মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে। উপরন্তু এসব গাথায় অর্থনৈতিক শ্রেণী বৈষম্যও কম ক্রিয়াশীল নয় এবং এই উচ্চ-নীচ ভেদ প্রবণতা দ্রাবিড় ভাষাভাষী নরগোষ্ঠির মধ্যে বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়েছিল। তাদের অস্পৃশ্যতাবোধ ক্রমে ভারতের বর্তমান বংশগত অনমনীয় জাতিভেদ প্রথায় পরিণত হয়।[৩৬] কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে, গাথা-গীতিকায় নারী প্রাধান্য ও তাদের জীবনের মর্মান্তিক পরিণতিতে মুক্ত-স্বাধীন প্রেমই যেন বৃক্ষের মূল শিকড়ের মত জীবনীশক্তি সঞ্চার করেছে। সেজন্যই নায়িকা চরিত্রগুলোকে নায়ক চরিত্রের তুলনায় অধিকতর আত্মসচেতন, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও দূরদর্শী বলেই প্রতীয়মান হয়। তাই বোধ করি কোন কোন নায়িকা উচ্চ শ্রেণীভুক্ত নায়ককে হৃদয়ের গভীর থেকে ভালোবাসা সত্ত্বেও শ্রেণী বৈষম্যগত পরিণতি ভাবনায় সরাসরি নায়কের কথায় আত্মসমর্পণ করেনি ঃ

আমারে কি আছে মনে সেত রাজার বেটা।
বড়র সঙ্গে ছোটর পিরীত দশের মধ্যে থুটা।।
বাউন হইয়া কেন চান্দে বাড়াই হাত।
পরবোধ দিতে পোড়া মনে না পাই কিছু আর।।[৩৭] — ধোপার পাট

এমন ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে 'মুহয়া', 'মুলয়া', 'চন্দ্রাবতী' প্রভৃতি গীতিকায়।

গীতিকায় নায়িকা চরিত্রগুলো অপরিসীম ধৈর্য সহিষ্ণুতা ইত্যাদি মানবিক গুণে সমৃদ্ধ। এগুণের কারণে বাঙালি সমাজ-সংসার স্বর্গ-সুখে ঋদ্ধ। জীবনে এমন কিছু নেই

৩৫. ঐ, পৃ. ১৯০-৯১

৩৬. *বাঙ্গালীর ইতিহাস* (আদিপর্ব), পৃ. ৭৫

৩৭. *পূর্ববঙ্গ গীতিকা* (২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা), পৃ. ১১

যার বিনিময়ে এরা এই সুখকে ধরে রাখতে চায় না বরং পতিকে কেন্দ্র করে এ সুখ তারা ইহকাল-পরকাল পরিব্যাপ্ত করতে চায় ঃ

১. আগু হইয়া পরিচয় কহে কঙ্কন দাসী।
কঙ্কনে কিন্যাছি ধাই নাম কঙ্কনদাসী।।....
আমি যে কঙ্কন দাসীরে রাজা শুন দিয়া মণ।
তোমার নারী কিন্‌ল দিয়া হাতের কঙ্কন।।[৩৮] — কাজলরেখা

২. দুঃখ নাই সুখ নাই অন্তর হইল খালি।
স্বামীর লাগিয়া কন্যা না হইল শোকালি।।....
কি জানি কান্দিলে স্বামী পাছে না হয় ভাল।
মনের যত শোক দুঃখ মুছিয়া ফেলিল।।[৩৯] — কাঞ্চনমালা

এখানে 'কাজলরেখা' ও 'কাঞ্চনমালা' উভয়ই স্বামীর মঙ্গলের জন্য সর্বংসহা মানবী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এদের একজন দাসীর প্রতারণায় স্বীয় পতিকে হারিয়ে সীমাহীন ধৈর্যে বুক বেঁধেছে। অপরজন পতির মঙ্গল কামনায় দুঃখে প্রাণ ফাটলেও গুরুর আদেশে চোখের পানি পর্যন্ত বিসর্জন দেয়নি। এমন কি এরা প্রণয়ীর আত্মীয় স্বজন দেবরকেও বিপদ থেকে উদ্ধারের নিমিত্তে আত্মোৎসর্গ করতে কুণ্ঠিত হয়নি। "বৌদ্ধ জাতকেও ত্যাগের সেইরূপ উদাহরণ অনেক স্থলে পাওয়া যায়।"[৪০]

এতসব আত্মবিসর্জনের পরাকাষ্ঠায় দাতা-কর্ণের[৪১] নামটিই স্মৃতিপথে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। দাতা কর্ণ যেমন অতিথিকে তুষ্ট করার মানসে আপন পুত্রকে বলি দিয়েছিলেন, ঠিক তেমনি গাথা-গীতিকায় চিত্রিত নায়িকা চরিত্রসমূহও যেন সবার সুখের জন্য আত্মোৎসর্গে স্বর্গসুখ অনুভব করেছিল। নিজেকে বিলিয়ে দেয়ার মধ্যেও যে সার্বিক সুখানুভূতি সঞ্চারিত হয় সে কথাই এসব নায়িকা চরিত্রের মধ্যে সন্নিহিত রয়েছে। আর এই পুঞ্জিভূত ত্যাগ-সহিষ্ণুতার প্রভাবই যেন বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ কিংবা জসীমউদ্দিনের উপন্যাস-কাব্য-নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে।

গাথা-গীতিকায় নায়িকাবৃন্দের আর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো যে, এরা

---

৩৮. ঐ, পৃ. ৩২৭-৩৮.

৩৯. ঐ, পৃ. ১১৮

৪০ . *পুরনারী*, পৃ. ১৮৩

৪১. ঐ. পৃ. ১৮৩

নিসর্গের ছোঁয়ায় উদার, সহজ-সরল ও লজ্জাশীল। এ যেন তাদের ঐতিহ্যগত কারুকার্যখচিত অঙ্গ-অলঙ্কার। এ অলঙ্কারের ঔজ্জ্বল্যে তারা কখনো কুসুম সদৃশ পল্লীবালা, কখনো বাঙালি গৃহবধু কিংবা স্নেহময়ী মা হিসেবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে ঃ

১. ভিনদেশী পুরুষ এই লাজে মাথা কাটে।
কেমন কইরা সন্ধ্যাবেলা একলা রইবাম ঘাটে।।[৪২] — মলুয়া

২ পঞ্চ ভাইয়ের মলুয়া কয় মাথার কিরা দিয়া।
ভাল দেইখ্যা সোয়ামীরে আগে করাও বিয়া।।
বুড়ি শাশুড়ী মোর না দেখে না শুনে।
কেমন কইরা কাটবে দিন এমন গুজরানে।।[৪৩] — মলুয়া

তাছাড়া 'মলুয়া' সম্পর্কে সমালোচকের মন্তব্যে উপলব্ধি জন্মে যে, "তিনি সতীনকে যে আদর দেখাইয়াছিলেন-তাহা নিতান্ত অকৃত্রিম।.... তিনি অকপটে সতীনকে ভালবাসিয়াছিলেন এবং নিজে সরলভাবে বিশ্বাস করিয়াছিলেন, সতীনও তাহাকে ভাল বাসে।"[৪৪] এই সহজ সরলতার জন্যই 'মদিনা' তালাকনামাকেও বিশ্বাস না করে তার বাস্তবতাকে হাসি মুখে উড়িয়ে দিয়েছিল ঃ

৩. তালাক নামা যখন পাইল মদিনা সুন্দরী।
হাসিয়া উড়াইল কথা বিশ্বাস না করি।।
আমার খসম না ছাড়িব পরাণ থাকিতে।
চালাকি করিল মোরে পরখ করিতে।।[৪৫] — দেওয়ানা মদিনা

গাথা-গীতিকার এসব পঙক্তিতে নারী চরিত্রের স্পষ্টতই সহজ-সরল-উদার-লজ্জাবতী-প্রেমিকা-বধু কিংবা মাতা হিসেবে আমাদের হৃদয় হরণ করে। এরা যেন সেই শাশ্বত বঙ্গের ঐতিহ্যবাহী সীতা-সাবিত্রী-বেহুলার মতো আমাদের আঙিনা জুড়ে রয়েছে এবং তাদের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়েছে আধুনিক কালের কবি-সাহিত্যিকের কাব্য-উপন্যাসে। এ ধরণের চরিত্রের সন্ধান প্রায় সব গীতিকায় মেলে।

---

৪২. *মৈমনসিং গীতিকা* (১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা), পৃ. ৫২

৪৩. ঐ. পৃ. ১২

৪৪. *পুরনারী*, পৃ. ২১৯

৪৫. *মৈমনসিংহ গীতিকা* (১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃ. ৩৭৭

গীতিকায় নায়িকা চরিত্রের পাশাপাশি সখি চরিত্রসমূহও যেন অপরিসীম প্রীতি, সরলতা, সহমর্মিতা, সহযোগিতা ও সহানুভূতি নিয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বলতে গেলে সখিরাই নায়িকার প্রকৃত স্বরূপ পরিস্ফুটনে সহায়তা দান করেছে।

শুন শুন বইন মহুয়া আমার মাথা খাও।
একলা কেন সইন্ধ্যা বেলা জলের ঘাটে যাও।।...
হাইম ফেলিয়া চাইয়া থাক ঠাকুর বাড়ীর পানে।
নদ্যার ঠাকুর পাগল অইছে শুনছি তোমার গানে।।[৪৬] — মহুয়া

'পালঙ্ক সইয়ে'র এমন আলাপনে 'মহুয়া'র পাথরচাপা বুকের দুঃখ অনেকটা লাঘব হয়ে প্রেমের গতিপথ নির্ধারিত হয়েছে। পরবর্তীকালে সে মহুয়ার সার্থক আত্মোৎসর্গের সাক্ষী হিসেবে নিজেই ট্রাজেডির মর্মজ্বালা তিলে তিলে অনুভব করে মহুয়ার প্রতি আমাদের সহানুভূতি আরো তীব্রতর করেছে ঃ

উঠ উঠ সখী তুমি কত নিদ্রা যাও।
আমি ডাকি পালং সই একবার কথা কও।।
ফিইরা গেছে বাদ্যার দল আর না আইব তারা।
সুখেতে বাধিয়া ঘর কর তুমি বাসা।।[৪৭] — মহুয়া

অর্থাৎ এখানে 'পালঙ্ক সই' যেন মহুয়ার পূর্ণাঙ্গ রূপদানে সমর্থ হয়েছে। তবে কোন কোন গীতিকায় সখির সম্পূরক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে 'ভাবী' চরিত্রসমূহ। এরাও রম্য-রসিকতার ছলে নায়িকার প্রেম-প্রবাহে দোলা দিয়েছে ঃ

পঞ্চ ভাইয়ের বৌয়ে ডাক্যা কয় ননদিনী।
সন্ধ্যাকালে জলের ঘাটে একলা কেন তুমি।।......
পরথম যৌবন কন্যা পরম সুন্দরী।
তরে দেখ্যা ননদিনী আমরা জ্বল্যা মরি।[৪৮] — মলুয়া

এখানে ভাবীদের রসিকতায় ননদ তার স্বপক্ষ সমর্থক খুঁজে পেয়ে অন্তর শক্তিতে বলীয়ান হয়েছে।

---

৪৬ . ঐ. পৃ. ২২
৪৭. ঐ, পৃ. ৪১-৪২
৪৮. ঐ. পৃ. ৫৪-৫৫

তবে 'মামী' চরিত্রগুলো যেন সখি চরিত্রের একেবারেই ইল্টোপীঠ। এরা ঈর্ষান্বিত চিত্তে নায়িকাকে সহযোগিতা দান না করে বরং সংসারের ঝামেলা ভেবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যন্ত্রণা দিয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে তাদেরকে অনিশ্চিত জীবনের দি ঠেলে দিয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে 'কমলা' পালার 'মামী' চরিত্রটির উল্লেখ করা যায়। আবার 'দেওয়ান ভাবনা' গাথায় 'মামা' অর্থলোভে ভাগ্নীকে তুলে দিচ্ছে লম্পট দেওয়ানের হাতে। এমন স্বার্থান্বেষী আত্মকেন্দ্রিক চরিত্র আমাদের সমাজে এখনো বর্তমান এবং এসব চরিত্র মধ্যযুগের প্রায় সব শাখার সাহিত্যে দৃশ্যমান - এমনকি আধুনিক সাহিত্যেও তা পরিব্যাপ্ত।

তৎকালীন সমাজে কিছু কিছু পতিতা সামন্ত প্রভুদের লাগামহীন যৌনপিপাসা নিবারণের লক্ষ্যে নিজেরা যেমন দেহ বিক্রিতে কুণ্ঠিত হতো না, তেমনি অধিক অর্থের লোভে সতী নারীদেরকেও ফুসলিয়ে ঐ সব লম্পট রাজা কিংবা জমিদারের সম্ভোগে মদদ যোগাতো। এরা কথায় কুলনারীদের বশ করতে না পারলে তন্ত্রমন্ত্র কিংবা তাবিজ-কবজে সে কাজে সর্বাত্মক সহযোগিতা করতো ঃ

শব্দে শুনি গোয়ালিনী পান পড়া জানে।
ঘর তনে কুলের বধু বাইরে টাইনা আনে।।
তেল পড়া দেয় যদি চিকন গোয়ালিনী।
সুয়ামী এড়িয়া যায় ঘরের কামিনী।[৪৯] — কমলা

এ থেকে বোঝা যায় তৎকালীন সমাজে নিরীহ মানুষের উপর বণিক-ধনিক কিংবা সামন্ত প্রভুদের অর্থজনিত লাম্পট্যের শিকড় কত গভীরে প্রোথিত ছিল। এভাবে সেদিন এই দূতীরা মালিনী, নাপিতনী, গোয়ালিনী প্রভৃতি নাম নিয়ে কত যে গরীব কৃষক বধূ-কুলবধূ কিংবা পল্লীবালার ইজ্জত আব্রু অন্ধকারে নিমজ্জিত করেছে তার ইয়ত্তা নেই। তবে দূতী চরিত্রগুলো কেবল মধ্যযুগেই আবদ্ধ থাকেনি বরং তাদের এ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আধুনিক কাল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' গ্রন্থে হীরা দাসী এবং মালতী গোয়ালিনী তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এসব ভ্রষ্টা নারী অনেক ক্ষেত্রে উচ্চ শ্রেণীভুক্ত মানুষের ভোগলীপ্সা নিবারণের উদ্দেশ্যে প্রতিনিয়ত নতুন মুখ সংগ্রহের কাজে স্থায়িভাবে নিয়োজিত হতো।[৫০] এমনকি এদের চরিত্রকে কেন্দ্র করে

৪৯. ঐ. পৃ. ১২৪

৫০. বঙ্কিমচন্দ্র, *বঙ্কিম রচনাবলী, ১ম খণ্ড*, কলিকাতা, ১৩৮৪, পৃ. ২৯৩-৯৪

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গ্রন্থও রচিত হয়েছে, যেমন 'দূতীবিলাস।'[৫১] প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, এ ধরণের সহযোগী লম্পট চরিত্রের কারণে গীতিকার অধিকাংশ নায়িকা চরিত্রের ঔজ্জ্বল্য অধিকতর বৃদ্ধি পেয়েছে বলে ধারণা জন্মে। কারণ, লম্পট ও তাদের সহযোগী ভ্রষ্ট নর-নারী নায়িকাদের সামনে পর্বত-প্রমাণ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করলেও নায়িকাবৃন্দ তাদের অন্তর শক্তিতে তা অতিক্রম করে সামগ্রিকভাবে প্রাধান্য বিস্তার করেছে। তবে দু' একটি পালায় দূতী চরিত্রের ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। সেখানে দূত-দূতী নায়িকার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র না করে বরং তার সফলতা অর্জনে পরিপূর্ণ সহযোগিতা দান করেছে। পক্ষান্তরে চন্দ্রাবতীর 'রামায়ণে'-এ ননদিনী ভাবীর প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে ভাবীকে ভাইয়ের কাছে চরিত্রহীনা বলে প্রতিপন্ন করেছে।

গীতিকায় 'মা' চরিত্রগুলো যেন স্নেহ-সোহাগে-বাৎসল্যে এক বিশেষ মানে উন্নীত হয়েছে। এদের বিশাল হৃদয় বিপদে আপদে প্রিয়জনের মঙ্গল-অমঙ্গল চিন্তায় অধীর হয়ে উঠেছে ঃ

লাগিয়া কার্ত্তিকের উষ গায়ে হইল জ্বর।
বিনোদের মায়ে কান্দে হইয়া কাতর।।
জোড়া মইষ দিয়া মায় মানসিক করে।
মায় ত কান্দিায় কয় পুত্র বুঝি মরে।।[৫২] — মলুয়া

এখানে আমরা বাৎসল্য রসের যে আধিক্য লক্ষ্য করি তা যেন জোড়া মইষ মানতের মধ্য দিয়ে অসহায় আদিম কৌম মায়ের মানসচেতনা স্মরণ করিয়ে দেয়। অনেক ক্ষেত্রে তারা সন্তানের দারিদ্র্য-মুক্তি কামনায় জীবন সংগ্রামী সাধারণ বাঙালি মায়ের প্রতিচ্ছবিও চিত্রিত করে। কিন্তু কিছু কিছু অভিজাত সামন্ত মায়ের সন্ধানও গীতিকায় মেলে - যাদের আচরণে সামন্তবাদী আভিজাত্যের অর্থ অহমিকাই প্রস্ফুটিত হয় ঃ

বাইদ্যার তামসা করাইতে কয়শ টেকা লাগে।....
শুন শুন নদ্যার চান রে বলিয়ে তোমারে।
বাইদ্যার তামসা করাও নিয়া বাইর বাড়ীর মহলে।।[৫৩] — মহুয়া

---

৫১. ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *দূতীবিলাস*, কলিকাতা, ১২৫৩
৫২. *মৈমনসিংহ গীতিকা* (১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা), পৃ. ৪৭
৫৩. ঐ, পৃ. ৮

পুত্রের আবদার রক্ষা করতে মা অর্থ ব্যয় করতে কুণ্ঠিত নয়। কোন কোন গাথায় (দেওয়ানা মদিনা) 'মা' চরিত্র কেবলমাত্র মাতৃত্বের জন্যই স্বামীকে দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ না করতে অনুরোধ করেছে। অধিকন্তু দু' একটি পালায় সন্তানহীনার শূন্য বুকেও মাতৃত্ববোধ ক্রন্দন করে উঠেছে।

'মা' চরিত্রের সঙ্গে সম্পূরক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে খুড়ী, জেঠী ও পড়শী নারীবৃন্দ। এদের বিশ্বাস ও ক্রিয়া কলাপে একটি যৌথ সামাজিক মানসিকতা ধরা পড়ে কখনো কখনো। বিশেষ করে নায়ক-নায়িকা চরিত্রের পূর্ণাঙ্গ রূপদানার্থে এদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা একটি ক্ষুদ্র লৌকিক বাংলা গড়ে তোলে বিয়ে মহলের আচার অনুষ্ঠানে। বর-কনের মঙ্গল-অমঙ্গলের চিন্তায় 'সোহাগ মাগন' এরূপ একটি আচার :

মাথায় লক্ষ্মীর কুলা অঞ্চলে ঘুরিয়া!
সোহাগ মাগিল মায় বাড়ী বাড়ী গিয়া।।..
জয়াদি জুকার দেয় পাড়ার যত নারী।
রাখিল মঙ্গল ঘট গঙ্গাজলে ভরি।।[৫৪]

বিয়ে বাড়ীর এমন অনুষ্ঠান বর-কনে উভয়ের আলয়ে অনুষ্ঠিত হয় এবং এগুলোর মধ্যে আবহমান বাঙালি নারীর আজন্ম মানসের সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র নারী প্রাধান্যই লক্ষ্মণীয় হয়ে ওঠে।[৫৫] একটি কথা এখানে উল্লেখ্য যে, গীতিকার সর্বত্রই

---

৫৪ ঐ, পৃ. ৬৭-৭১

এই লক্ষ্মী কৃষিসমাজের মানস কল্পনার সৃষ্টি। *বাঙ্গালীর ইতিহাস*, পৃ. ৫৯১

"আর্য-ব্রাহ্মণ্য বা বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি সম্প্রদায়ের ধর্ম, কর্ম, শ্রাদ্ধ, বিবাহ, জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি সংক্রান্ত বিশ্বাস, সংস্কার ও আচারানুষ্ঠান, নানা দেবদেবীর রূপ ও কল্পনা, আহার বিহারের ছোঁয়া ছুঁয়ি অনেক কিছুই আমরা সেই আদিবাসীদের নিকট হইতে আত্মসাৎ করিয়াছি। আমাদের সমস্ত শুভানুষ্ঠানে যে আম্র পল্লবের ঘটের প্রয়োজন হয়, যে কলাবৌ পূজা হয়, অনেক ব্রতে যে ধানের ছড়ার প্রয়োজন হয়, এ সমস্তই সেই আদিবাসীদের ধর্মকর্মানুষ্ঠানের এবং বিশ্বাস ও ধারণার স্মৃতি বহন করে।" বাঙ্গালীর ইতিহাস, পৃ. ৫৭৬

৫৫. আমাদের দৈনন্দিন অনেক আচার অনুষ্ঠানই বাংলার আদিমতম জন ও কোমদের ধর্মবিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত। বাংলাদেশে, বিশেষভাবে পূর্ববাংলায় এক বিবাহ ব্যাপারেই পানখিলি, গাত্র হরিদ্রা, গুটি খেলা, ধান ও কড়ির স্ত্রী আচার ও খৈ ছড়ানো, লক্ষ্মীর ঝাঁপি স্থাপনা, দধিমঙ্গল প্রভৃতি সমস্তই আদিবাসীদের দান বলিয়া অনুমিত। বাঙ্গালীর ইতিহাস, পৃ. ৫৭৬

নিম্নশ্রেণীর মানুষগুলো যেমন ধোপা-ধোপানী, জেলে-জেলেনী এরা বরাবরই অসহায় নায়ক-নায়িকাকে আশ্রয়দান করেছে এবং এরা কখনোই জুলুমবাজ, লম্পট কিংবা অমানবিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়নি। কিন্তু সে তুলনায় শাহ্-সামন্ত-শাসক-প্রশাসক-ধনিক-বণিক-দেওয়ান-কাজী প্রভৃতি অর্থনৈতিক সঙ্গতিসম্পন্ন পুরুষবৃন্দই যত রকম অমানবিক কর্মের সঙ্গে জড়িত বলে দৃশ্যমান হয়।

গীতিকায় নারী চরিত্রের তুলনায় পুরুষ চরিত্রের মধ্যে বড় বেশি সংকীর্ণতা, অহংকার, স্বেচ্ছাচারিতা, বর্বরতা, নির্মমতা, লাম্পট্য প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। তারা যেন সবদিক থেকে নারীদের চাইতে স্থবির, অনগ্রসর, বন্য, খল কিংবা অপ্রধান চরিত্র বলে পরিগণিত হয়েছে। অধিকন্তু তারা কখনই গীতিকার কাহিনী নিয়ন্ত্রণে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করেনি বরং নারীরাই তাদের চলনে-বলনে, আচার-আচরণে, উদারতায়-দৃঢ়তায়, প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে, সংযম-সহিষ্ণুতায়, প্রেমে-আত্মত্যাগে, তেজস্বিতায়-উদ্ভাবনী শক্তিতে সর্বত্র মধ্যমণির মত প্রাধান্য বিস্তার করেছে।

"পল্লী-কল্পনা যে সকল রমণী চিত্র আমাদের গোচর করিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটিতে কোন না কোন গুণ বিশেষভাবে ফুটিয়াছে। সাধুত্ব ও চরিত্রগুণে সকলেই পূজ্য ও শ্রদ্ধা-ভাজন, কিন্তু কাহারও মধ্যে অদ্ভুত তেজস্বিতা, উদ্ভাবনী শক্তি, কাহারও মধ্যে চূড়ান্ত স্বামী প্রাণতা, কাহারও মধ্যে অপূর্ব সংযম দৃষ্ট হয়, প্রত্যেকেরই মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, এবং আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে প্রায় একশত পল্লী-চিত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তন্মধ্যে পুনরাবৃত্তি দোষ, এবং একটি আদর্শকেই বারংবার বেশ পরিবর্তন পূর্বক প্রদর্শন, অনর্থক বাক্য-বাহুল্য প্রভৃতি অসঙ্গতি ও অপূর্ণতা নাই। প্রত্যেক চরিত্র ভিন্ন ভিন্ন এবং সুস্পষ্ট রেখায় অংকিত। এদেশে যে সকল কবি প্রাচীনকালে মহিলা-চরিত্র আঁকিতে গিয়াছেন, তাহার সমস্ত স্থানেই যে সকল চরিত্র সীতা-সাবিত্রীর ছাঁচে ঢালাই করা হইয়াছে, কিন্তু বাঙ্গালার এই পল্লীর ঐশ্বর্য্য কি বিরাট। এই চিত্রশালায় প্রায় ৫০টি আদর্শ রমণী পাইতেছি, তাহার কাহারও সাহস দুর্জয়, কেহ উগ্র-প্রকৃত, কেহ নানা বিরুদ্ধ অবস্থার পরীক্ষায় ও স্বীয় অকুণ্ঠিত নির্ভিকতা বলে সর্বত্র জয়ী। এই সকল চিত্র পরিকল্পনায় পাঠক কোন নৈতিক বা ধর্ম্ম-সূত্র পাইবেন না। পল্লী কবির হাতের কাছে একটি মাত্র শাস্ত্র ছিল, অন্য কোন পণ্ডিতী অনুশাসন ছিল না। সে শাস্ত্র প্রকৃতি। এই গুরুই কবিকে ভাল-মন্দের বিচার শিখাইয়াছেন, তিনি অন্য কোন শাসনের অনুবর্তী হন নাই।"[৫৬]

---

৫৬. *পুরনারী*, পৃ. ৫৩

কিন্তু ডঃ সেনের মন্তব্য প্রসংগে একটি কথা উল্লেখ না করে পারা যায় না যে, তিনি গাথা-গীতিকায় বিকশিত নারী চরিত্রের স্বরূপ উদঘাটনে কেবল প্রকৃতিকেই সমধিক গুরুত্ব দান করেছেন। কিন্তু গভীর পর্যালোচনায় দেখা যায়, নারী চরিত্রসমূহ বাস্তব এবং জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। তাছাড়া সবগুলো চরিত্রকে এ অর্থে বা সমীকরণে ফেলা যায় না এবং তারা সামগ্রিকভাবে টাইপ চরিত্রও নয়। বরং তারা রক্ত-মাংসে গড়া আমাদেরই সমাজের বিচিত্র মানুষ। মানুষের সমাজে এমন বৈচিত্র্য খুবই স্বাভাবিক ও বাস্তব এবং তা গাথা-গীতিকায় বস্তুনিষ্ঠভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

অতএব, গাঁথা-গীতিকার নারী চরিত্রসমূহের স্বরূপ সৃজনের পিছনে প্রেম-প্রকৃতি-নিসর্গ-ঐতিহ্য-রক্ত-বংশ প্রভৃতি যেভাবেই ক্রিয়াশীল থাক না কেন সমসাময়িক সমাজের ধর্ম-বর্ণ-কৌলিন্য-সামন্তবাদী প্রথা এবং ধনিক-বণিক শ্রেণীর অর্থজনিত লাম্পট্য ও রূপজমোহ কম কার্যকর ছিল না। ফলে গীতিকার নারী চরিত্রের স্বরূপ উদঘাটনে তৎকালীন সমাজের সামগ্রিক প্রতিবেশকে দায়ী করা যায়। বোধ করি, এ সমস্ত কারণেই অনেকে গীতিকাগুলোকে বস্তুধর্মী উপন্যাসের পূর্বসূরি বলেই আখ্যাত করেছেন।